বিচিত্রা ৮ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ৫ই মে, ২০০৬

বিবর্তনের পথ ধরে

বন্যা আহমেদ

কোপার্নিকাস তোমরে গিয়ে বাঁচলেন চার্চের রোষানল থেকে, মৃত্যুশয্যায় শোয়ার আগে তিনিও সাহস করেননি সৌরকেন্দ্রিক মতামতটি প্রকাশ করতে! বৃদ্ধ গ্যালিলিও হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন, সাহসী ব্রুনোকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে...

তৃতীয় অধ্যায়

অনন্ত সময়ের উপহার

(গত সংখ্যার পর)

ছয় হাজার বছর বনাম কোটি কোটি বছর! মানুষের সীমিত ৭০-৮০ বছরের জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকশ' কোটি বছর হাতে পাওয়াকে অনন্তকাল বলেই তো মনে হওয়ার কথা। আগের অধ্যায়ে আমরা জেমস হাটন আর চার্লস লায়েলের কথা শুনেছি, তারাই দিয়েছিলেন ডারউইনকে এই মূল্যবান 'সুদীর্ঘ সময়ের' উপহার। অনেকে মনে করেন ডারউইন এদের কাছ থেকে এই অমূল্য উপহারটা না পেলে তিনি তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বটা এত সহজে প্রমাণ করতে পারতেন না! প্রাণের বিবর্তন ঘটতে, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে লাগে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর! ডারউইন কীভাবে বিবর্তন এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতেন যদি তার মাথাটা বাইবেলের এই ছয় হাজার বছরের গণ্ডিতেই আটকে থাকত? একটা বৈজ্ঞানিক মতের পূর্ব শর্তই যদি পূরণ করা না যায় তাহলে তত্ত্ব হিসেবে তাকে উপস্থাপন করা হবে কি করে? আদম হাওয়াকে না হয় আল্লাহ বা ঈশ্বর চোখের পলকে তৈরি করে টুপ করে পৃথিবীর বুকে ফেলে দিতে পারে, কাল্পনিক গল্প ফাঁদতে তো আর সাক্ষ্য প্রমাণের দায়ভার থাকে না! কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মানুষের সামনে হাজির করতে হলে তো লাগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, প্রমাণ এবং যুক্তির সমন্বয়! ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের বুড়ো পৃথিবী কখন এই কাল্পনিক ছয় হাজার বছরের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে গেল; কখন তার অসীম ব্যাপ্তি বিলীন হয়ে গেল মানুষ নামের এই দ্বিপদী প্রজাতিটার কল্পনা, কুসংস্কার আর ক্ষুদ্রতার মাঝে? খুব বেশিদিন আগে কিন্তু নয়, ১৬৫৪ সালে আইরিশ ধর্মযাজক জেমস আসার বাইবেলের সব জন্মতালিকা হিসাব কষে বের করেছিলেন যে আমাদের পৃথিবীর বয়স নাকি ছয় হাজার বছর! অবশ্য মনে করা হয় যে এই ধরনের একটা গল্প ইউরোপীয় সমাজে হয়তো আরও আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কারণ এর বেশ কিছুদিন আগে লেখা শেক্সপিয়ারের As You Like It নাটকে ছয় হাজার বছর বয়সের পৃথিবীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে জেমস আসারই এই ধারণাটাকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন এবং তার ফলাফল হলো ভয়াবহ–বিশেষ করে ভূতত্ত্ববিদ্যার ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়ল আরও কয়েকশ' বছরের জন্য। আর তার হাত ধরে পিছিয়ে পড়ল বিবর্তনবাদসহ জীববিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রগতি।

আসলে তো বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের এই সংঘাত কোনও নতুন ঘটনা নয়। ধর্ম কোনও যুক্তি মানে না, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাস, আর এদিকে বিজ্ঞান হচ্ছে ঠিক তার উল্টো, তাকে নির্ভর করতে হয় যুক্তিহীন-শর্তহীন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের ওপর। কোনও প্রকল্পকে (hypothesis) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (theory) জায়গায় উঠে আসতে হলে তাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে আসতে হয়–প্রথমে গভীর পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যার বিবরণ, সম্ভাব্য কারণ, ফলাফল ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে প্রকল্পটা প্রস্তাব করা হয়, তারপর তাকে প্রমাণ করার জন্য চলতে থাকে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফল এবং তথ্যের মাধ্যমে যদি প্রকল্পটাকে প্রমাণ করা না যায় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়। আর যদি দীর্ঘদিন ধরে বারবার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা যায় এবং অন্য কোনও বিজ্ঞানী এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোনও তথ্য হাজির না করেন তবেই তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেয়া হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তার সাক্ষ্য প্রমাণের দায় কখনওই শেষ হয় না, বিজ্ঞানে বিমূর্ত বা অনাদি সত্য বলে কোনও কথা নেই। এই প্রক্রিয়ায় একটা প্রচলিত এবং প্রমাণিত তত্ত্বকেও যে কোনও সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করা যেতে পারে, আজকে একটা তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিলে কালকেই তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না এমন কোনও কথা নেই। তাই আমরা দেখি, নিউটনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জগতে কয়েকশ' বছর ধরে রাজত্ব করার পরও আইনস্টাইন এসে বিশেষ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার অসারতা প্রমাণ করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণের কোনও শেষ নেই, কারণ–

'বিজ্ঞান কোনও তত্ত্বকে পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না, বিজ্ঞান ধর্মের মতো স্থবির নয়, সে গতিশীল। এখানেই তার সাথে ধর্মের পার্থক্য। ধর্ম মানুষকে প্রশ্ন করতে বারণ করে, হাজার বছরের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়াই ধার্মিকের দায়িত্ব।'

প্রশ্ন করা যাবে না সৃষ্টিকর্তা কীভাবে সৃষ্টি হলো, পৃথিবী আসলেই সমতল কিনা, ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা মতো আসলেই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কিনা! চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে যে একজন সৃষ্টিকর্তার হাতে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তারা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই রয়ে যাবে অনাদিকাল ধরে। হাজারও সাক্ষ্য প্রমাণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এর সবই ভুল, সবই মানুষের আদিম অজ্ঞানতার ফসল, কিন্তু তবুও এই মিথ্যাকেই যেন মেনে নিতে হবে! আশার কথা হচ্ছে কিছু সচেতন এবং সাহসী মানুষ বহু অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, আর তারই ফলশ্রুতিতে এগিয়ে গেছে মানব সভ্যতা। তাই আমাদের এই সভ্যতার ইতিহাস হাজারও রক্তাক্ত সংঘাতে ভরা–কোপার্নিকাস তোমরে গিয়ে বাঁচলেন চার্চের রোষানল থেকে, মৃত্যুশয্যায় শোয়ার আগে তিনিও সাহস করেননি সৌরকেন্দ্রিক মতামতটি প্রকাশ করতে! বৃদ্ধ গ্যালিলিও হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন, সাহসী ব্রুনোকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে...

সে যাই হোক, এখন তাহলে দেখা যাক, এই যাত্রায় মানব সভ্যতা কি করে বেরিয়ে এসেছিল ছয় হাজার বছরের ভয়াবহ চক্রাবর্ত থেকে। চট করে একবার ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে

নিলেই আমরা দেখতে পাব এখানেও সেই একই কাহিনী, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেই সংঘাতময় দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সতেরশ' শতাব্দীতে ধর্মভীরু জেমস আসার যখন বাইবেলের জেনেসিস (বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টতত্ত্বের উপর অংশ) থেকে হিসাব কষে পৃথিবীর বয়স বের করলেন তখন কিন্তু তার মনে সংশয়ের সৃষ্টি হলো না। তিনি প্রশ্ন করলেন না যে তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গণনা করছেন তা কি করে বা কোথা থেকে আসল–দেড় হাজার বছর ধরে বাইবেলে স্রষ্টার বচন বলে যা বলা আছে তাকেই তিনি পরম সত্য বলে মেনে নিলেন। এর বেশ আগেই অন্ধকার মধ্যযুগের ইতি ঘটে গেছে ইউরোপে, রেনেসাঁর যুগ মোটে শেষ হয়েছে, আর বিজ্ঞান হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওর মতো কিছু সাহসী বিজ্ঞানীর হাত ধরে পদার্থবিদ্যা এগিয়ে যেতে শুরু করলেও, জীববিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্ববিদ্যা তখনও ধর্মের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যার কারাগারেই জিম্মি থেকে গিয়েছিল। পৃথিবীর বয়স, প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রজাতির সৃষ্টি বা বিলুপ্তির ব্যাখ্যার জন্য মানুষ তখন বাইবেল, কোরান বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে বলা কাল্পনিক গল্পগুলোরই শরণাপন্ন হতো। ষোলশ' শতাব্দীর ইউরোপে যে কোনও মানুষকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আপনি জেনেসিসের গল্প ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের জিজ্ঞেস করলেই হয়তো পেতেন বেশ অন্য ধরনের একটা উত্তর–পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশি, বাইবেলের কথাগুলোকে রূপক হিসেবেই নেয়া উচিত, বিজ্ঞানের সাথে একে গুলিয়ে ফেলার কোনও দরকার নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিন্তার এই উত্তরণ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। আসলে, বিজ্ঞানমনস্ক কিছু মানুষ আরও অনেক আগে থেকেই এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে সেই ১৫১০ সালেই লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci, 1452-1519) সামুদ্রিক প্রাণী এবং ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের শিলাস্তূপ পরীক্ষা করে তার ডাইরিতে লিখেছিলেন, পৃথিবীর মোটেও ছয় হাজার বছরে বা নূহের প্লাবন থেকে তৈরি হয়নি, এর তৈরি হতে লেগেছে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় (৯)। তারপর সতেরশ' এবং আঠারশ' শতাব্দীতে রেঁনে দেকার্তে (Rene Descartes, 1596-1650) থেকে শুরু করে বুঁফো (Comte de Buffon, 1707-1788), কান্ট (Imanuel Kant, 1724-1804) পর্যন্ত অনেকেই তখনকার দিনের সীমিত জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর বয়স নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন (৩)। এদের মধ্যে অনেকেই ভূপৃষ্ঠ কিংবা পাহাড়ের গঠন, ক্ষয়, শিলাস্তর, ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছরের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এত বিশাল ও ব্যাপক পরিবর্তন এত কম সময়ে ঘটা সম্ভব নয়–পৃথিবীর মাটি এবং জলের মধ্যে বহুবার স্থান বদল হয়েছে, আজকে যে পাহাড়গুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে তারা অনেকেই হয়তো একসময় সমুদ্রের নিচে ছিল! বুঁফো ১৭৭৪ সালে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে পৃথিবীর ঠাণ্ডা হয়ে এই অবস্থায় আসতে কত সময় লাগতে পারে তার হিসাব করে প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবীর বয়স ৭৫ হাজার বছর বা তারও বেশি হবে (১০)।

তার পরপরই ১৮০০ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চেও পা রাখলেন ভূতত্ত্ববিদ জেমস হাটন (James Hutton 1726-1797), তিনি তার সারা জীবনের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জ্ঞান থেকে ১৭৮৫ সালে বললেন–পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশি, পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে যে রকমের ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা কোনওমতেই কয়েক হাজার বছরে সৃষ্টি হতে পারে না, বহু কোটি বছর ধরে ধীর গতিতে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে।

'অনেকে মনে করেন জেমস হাটনই হচ্ছেন ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক এবং তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাইবেলের বিপর্যয়বাদ বা প্রলয়বাদের বিরোধিতা করে deep time বা 'সুদীর্ঘ সময়ের' ধারণার প্রচলন ঘটান। তিনি বললেন, আরম্ভেরও যেমন কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি শেষ হওয়ারও কোনও ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। সে সময় পৃথিবীর বয়স হিসাব করে বের করার মতোও প্রযুক্তি হাতে না থাকায় তিনি ধরে নেন যে এর বয়স অসীম।'

নারায়ণ সেন তার লেখা 'ডারউইন থেকে ডি এন এ' বইটিতে চমৎকার কিছু পরিসংখ্যান এবং উদাহরণ দিয়েছেন–'বিশদ ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সূত্রে হাটন বুঝেছিলেন প্রকৃতি আদতে ধীর গতিতে পৃথিবীর চেহারা পালটায়, যতই আমরা ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুফানে কাতর হই না কেন। এই ধীর গতির রূপটি কয়েকটি আধুনিক পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। জমির ক্ষয়ের কারণে গড়পড়তায় প্রতি হাজার বছরে নিচু জমিতে আনুমানিক মাত্র এক থেকে তিন সেন্টিমিটার এবং পাহাড়ি এলাকায় কুড়ি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার মতো উত্তোলিত হচ্ছে। পৌরাণিক কাল থেকে হিমালয়ের সম্ভবত তিনশ' থেকে চারশ' মিটারের মতো উচ্চতা বেড়েছে। বস্তুত ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বলছে ছয় কোটি বছর আগে হিমালয়ের তখনকার মাটি ও স্তর সমষ্টি সমুদ্রের তলদেশে ছিল' (১)। কিন্তু এসব পরিসংখ্যান তো তখন হাটনের হাতের সামনে ছিল না, সে সময়ের রক্ষণশীল ইউরোপীয় সমাজ তাই হাটনের মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এবং এক সময় দেখা যায় তার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছেই দেয়া হয়েছে।

প্রায় এক প্রজন্ম পর যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন লায়েল। ১৮৩০ সালে লায়েল বললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনগুলো ক্রমাগতভাবে ধীর প্রক্রিয়ায় অনন্তকাল ধরে ঘটেছে। বাইবেলের পথ ধরে শুধু নূহের মহাপ্লাবনের প্রলয়বাদ দিয়ে এদেরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য শুধু এই ধীর এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়াকেই ভূস্তরের পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যা পরে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আসলে ধীর এবং আকস্মিক–দুই পদ্ধতিতেই কোটি কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে। লায়েল সে সময় অত্যন্ত সুচারুভাবে তখনকার রক্ষণশীল ধার্মিক সমাজে তার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সে সময় চার্চের মধ্যযুগীয় প্রবল প্রতাপ যেহেতু দুর্বল হয়ে আসতে শুরু করেছিল তাই তাকে ব্রুনো বা গ্যালিলিওর মতো অবস্থার শিকার হতে হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞান তো আর সেখানে থেমে থাকেনি। ১৮৬২ সালে লর্ড কেলভিন তাপগতি বিদ্যার (Thermo Dynamics) সূত্র ব্যবহার করে পৃথিবীর বয়স ৯৮ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৮০ লাখ বছর বলে ঘোষণা করলেও পরে ১৮৯৭ সালে তাকে সংশোধন করে ২০-৪০ মিলিয়ন বছরে নামিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) প্রথমবারের মতো রেডিও অ্যাকটিভ পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স মাপার কথা প্রস্তাব করেন। তার কয়েক দশকের মধ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বা সাড়ে চারশ' কোটি বছর (১০)।

সে যাই হোক, এবার আবার ফিরে আসা যাক ডারউইনের গল্পে। হাটন এবং লায়েলের এই অবদানের হাত ধরেই চার্লস ডারউইন প্রকৃতি বিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানকে নিয়ে গেলেন এক নতুন স্তরে। এরাই উন্মুক্ত করে দিলেন দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করার বহু শতাব্দীর বন্ধ দুয়ারটি। আমরা আগের অধ্যায় দেখেছি যে বিগেল জাহাজে সমুদ্র যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়েই ডারউইন ক্রমশ জীবজগতের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠেছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে শুরু করেছেন যে, জীবজগৎ স্থবির নয়, কোনও দিন ছিলও না, সৃষ্টির আদি থেকেই এর বিবর্তন ঘটে আসছে। ইংল্যান্ডে ফিরে এসেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লেগে যান। ১৮৩৮ সালে, আমরা দেখি, প্রথমবারের মতো ডারউইন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লিখেছেন,

'এভাবেই মূল প্রজাতি থেকে প্রকারণসমূহ (Variation) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রজাতির জন্ম হয়, আর মূল প্রজাতিটি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে টিকে যাওয়া প্রজাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়...' (২). তিনি নিঃসংশয়ভাবে বললেন প্রজাতি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, একযুগ থেকে আরেক যুগে অভিযোজনের (অ্যাডাপশন) মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।'

কিন্তু এখন সমস্যা হলো কীভাবে সবাইকে তিনি বোঝাবেন যে এত দিন ধরে তোমরা যা বিশ্বাস করে এসেছ তা সবই ভুল! তোমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো শুধু কল্পনাপ্রসূতই নয় চরম মিথ্যা আর ধোঁকায় ভরা! তিনি কি জানেন না বাইবেলকে চ্যালেঞ্জ করার পরিণতি, তিনি কি ভুলে গেছেন তার পূর্বসূরি কোপার্নিকাস, বৃদ্ধ গ্যালিলিও বা সাহসী ব্রুনোর কথা! তাহলে ডারউইন এখন কী করবেন?

১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮–দীর্ঘ ২০ বছর! ডারউইন মনোনিবেশ করলেন তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। লোকজনের সাথে বেশি মেশেন না, নিজের মনে গাছপালা, পোকামাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এমনকি লন্ডন থেকে ১৬ মাইল দূরে বাড়ি কিনে পরিবার নিয়ে উঠে আসেন নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু বারবারই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন তিনি, সে এক অদ্ভুত অসুস্থতা, প্রায়ই শরীরটা খারাপ থাকে, মাথা ব্যথা, পেটের অসুখ কখনওই নাকি পিছ ছাড়ে না! কোনও ডাক্তারই অসুখটা কি তা ধরতে পারেন না। অনেকেই তখন মনে করেন যে তার অসুখটা হয়তো ছিল নিতান্তই মানসিক, এত বড় একটি আবিষ্কারকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অসহ্য ভার আর বইতে পারছিলেন না তিনি। খুব সাবধানে এবং গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। ভূতত্ত্ব এবং জীব বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপর অন্যান্য বই প্রকাশ করতে থাকলেও তার এই বিবর্তনের উপর কাজ সম্পর্কে লায়েল, হুকার, বা হাক্সলির মতো দুই চারজন বিজ্ঞানী বন্ধু ছাড়া আর কাউকে কিছু জানাতেন না তিনি। বিবর্তন যে ঘটছে তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কি প্রক্রিয়ায় তা ঘটছে বা এর চালিকাশক্তি কি হতে পারে তা সম্পর্কে তখনও কোনও নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারেননি। সিদ্ধান্ত নিলেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত তথ্য প্রমাণসহ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পারা পর্যন্ত কোনওভাবেই এই আবিষ্কারের কথা জনসমক্ষে প্রচার করবেন না। তাই পরবর্তী বিশ বছর ধরে তিনি অত্যন্ত গভীর অধ্যবসায়ের সাথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৮৫৮ সালে অপ্রত্যাশিত একটি চিঠি এসে পৌঁছায় ডারউইনের হাতে। তার ভেতরে ছিল আলফ্রেড ওয়ালেসের (১৮২৩-১৯১৩) বিবর্তন নিয়ে লেখার একটি পাণ্ডুলিপি। ডারউইন বিস্ময়ের সাথে দেখলেন যে আজকে ২০ বছর ধরে যে তত্ত্ব নিয়ে তিনি গোপনে কাজ করে আসছেন তা মাত্র তিন বছরেই ওয়ালেস আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি অত্যন্ত আশাহত মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন পর্যন্ত করা সব কাজ ধ্বংস করে ফেলবেন। কিন্তু এরপর বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত 'On the origin of species by means of Natural Selection বা প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করে ফেলতে রাজি হলেন। তখনই ঠিক করা হয় যে, ১৮৫৮ সালে লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির এক অধিবেশনে ডারউইনের এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩) এর বিবর্তনবাদ তত্ত্ব আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব করা হবে। অনেকে মনে করেন প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন যেভাবে অগুনতি উদাহরণ, পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ওয়ালেস তার ধারে কাছেও যেতে পারেননি। ডারউইন এত বিস্তারিতভাবে বইটি না লিখলে শুধু ওয়ালেসের লেখা দিয়ে যুগান্তকারী এই বিবর্তনবাদ তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারত না। ওয়ালেস নিজেই পরবর্তী সময়ে 'ডারউইনবাদ' নামক একটি বই লেখেন এবং তাতে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মূল কৃতিত্ব যে ডারউইনেরই তা স্বীকার করে নেন (৩)।

তাহলে দেখা যাক ডারউইন এমন কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যার ফলে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল চিরতরে। তিনি তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার এই আবিষ্কারের প্রমাণ পেতে বিজ্ঞানীদের আরও প্রায় এক শতক সময় লেগে গেল! ডারউইন দেখলেন, হাজার হাজার বছর ধরে কৃষকরা এবং পশু পালকরা কৃত্রিম নির্বাচনের (artificial selection) মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়িয়েছে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন জাতের প্রাণীর সৃষ্টি করেছে। সে সময়ে জীববিজ্ঞান কিংবা জেনেটিক্স সম্পর্কে কিছুই না জেনেও, তারা শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সঠিকভাবেই বুঝেছিল যে, অনেক বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। যেমন, যে ধানের গাছের জাত থেকে অনেক বেশি বা উন্নত মানের ধান উৎপন্ন হয়, ক্রমাগতভাবে শুধু সে ধরনের ধানের বীজই যদি চাষের জন্য নির্বাচন করা হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে শুধু উন্নত মানেরই ধান উৎপন্ন হচ্ছে। যে গরু বেশি দুধ দেয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যদি শুধু সে ধরনের গরুকেই বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে, পুরো গরুর পালের মধ্যেই গড়পড়তা দুধ দেয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে। তার মানে কয়েক প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে সতর্ক, কৃত্রিম নির্বাচন

নেকড়ে থেকে কুকুরের বিবর্তন :
http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/images/le_dogs2.gif

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন জাতের পশু বা উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব যাদের মধ্যে শুধু কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলোই দেখা যাবে। এক সময় তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলো এত বেশি হয়ে যায় যে তারা সম্পূর্ণভাবে এক নতুন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদে পরিণত হয়ে যেতে পারে, যার সাথে তাদের পূর্বপুরুষের প্রজনন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই মানুষ হাজার বছর ধরে বুনো নেকড়েকে পোষ মানিয়ে কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের কুকুরের সৃষ্টি করেছে (৪)। এখন যদি অন্য কোনও গ্রহ থেকে কেউ আমাদের এই পৃথিবীতে এসে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন রকমের কুকুরগুলোকে দেখে, তাহলে তাদের পক্ষে কোনওভাবেই অনুমান করা সম্ভব হবে না যে এরা এক সময় সবাই নেকড়ে প্রজাতির বংশধর (৪) ছিল। ফার্মের মোটা মোটা মুরগি বা বিশাল মাংসওয়ালা অস্ট্রেলিয়ান গরুগুলোকে দেখে আমাদের যে ভিমরি খাওয়ার জোগাড় হয় তাদেরকে এভাবেই কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে (এখন অবশ্য অনেক ধরনের কৃত্রিম পদ্ধতি এবং ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। তার মানে মানুষ কৃত্রিমভাবে নির্বাচন করে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে আসছে সেই অনাদিকাল থেকেই! ডারউইন দেখলেন, এরকম কৃত্রিমভাবে নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে তার আশপাশে মানুষ প্রায় ১০ রকমের কবুতর তৈরি করেছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এতখানিই যে, প্রাকৃতিকভাবে এদের সৃষ্টি হলে এদেরকে খুব সহজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে ধরে নেয়া হতো (৩)। তাহলে কি প্রকৃতিতেও এমনই কোনও প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ঘটছে?

ডারউইন আরও লক্ষ্য করলেন, আমাদের চারপাশের গাছ এবং প্রাণীরা যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে তার বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একটা পুরোপুরি বড় হওয়া কড মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটি মেপল বা আম বা জাম গাছে

হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে, কিন্তু এর বেশিরভাগই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে, আমাদের দেশের ইলিশ মাছের কথাই চিন্তা করে দেখুন না। সমুদ্র থেকে নদীগুলোতে এসে তারা কি হারে ডিম পারে আর তাদের মধ্যে ক'টাই বা শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়ে টিকে থাকতে পারে!
বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে একটা কড মাছের ডিমের ৯৯% ই প্রথম মাসেই কোনও না কোনওভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বাকি যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোনও না কোনওভাবে মৃত্যুবরণ করে (৮)। ডারউইনও এই একই জিনিস দেখিয়েছেন হাতির বংশবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হাতির বংশবৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে খুবই কম, কিন্তু তারপরও একটা হাতি তার জীবনে যে ক'টা বাচ্চার জন্ম দেয় তার মধ্যেও সবগুলো শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। ডারউইন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, হাতি অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতি থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লাখ হাতির জন্ম হবে (৮)।
প্রকৃতিতে প্রায় সব জীবই এরকম বাড়তি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়, হিসাব করে দেখা গেছে যে, এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বংশ বৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী আড়াই ফুট উঁচু করে ঢেকে দিতে পারত। একটা ঝিনুক কিংবা কাছিম একবারে লাখ লাখ ডিম ছাড়ে, একটা অর্কিড প্রায় ১০ লাখ বীজ তৈরি করতে পারে (৩)। মানুষের জনসংখ্যার কথাই চিন্তা করা যাক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি ঘটার আগে অর্থাৎ মাত্র এক-দেড়শ' বছর আগেও শিশু মৃত্যুর হার ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশি। (আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে, কৃত্রিমভাবে আমরা এখন একদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে শিশু আধুনিক চিকিৎসার কল্যাণে মৃত্যুর হারও কমিয়ে আনতে পেরেছি)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এভাবেই সব জীব যদি বংশবৃদ্ধি করতে থাকত, অর্থাৎ একেকটা জীব তার সারা জীবনে যতগুলো ডিম বা বাচ্চার জন্ম দিতে সক্ষম তার সবগুলো যদি টিকে থাকত তাহলে এতদিনে পৃথিবীতে আর কারোরই থাকার ঠাঁই হতো না। আসলে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে ঠিক এর উল্টোটা ঘটছে– সংখ্যার দিক থেকে যত উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয় বা বেঁচে থাকে, তার তুলনায় তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বহু গুণ বেশি। শেষ পর্যন্ত এর মধ্যের ছোট্ট একটি অংশই শুধু বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। যে কোনও প্রজাতি হঠাৎ

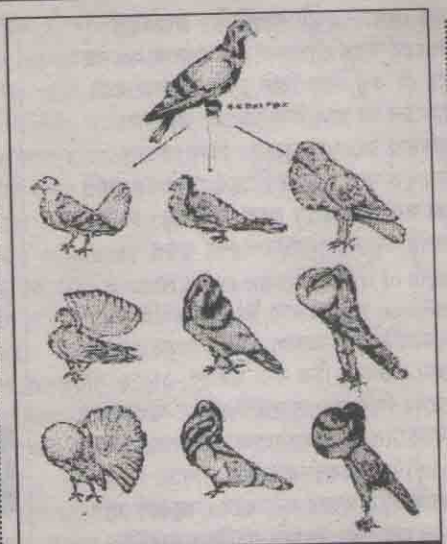

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের কবুতর : http://www.mun.ca/biology/scarr/Darwin's_pigeons.gif

করে অনেক বেশি হারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি প্রাকৃতিক নিয়মেই বদ্ধ হতে হবে, কারণ তাদের সবার বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের বা অন্যান্য সম্পদের প্রয়োজন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডারউইন ভাবলেন, তাহলে প্রকৃতিতে প্রাণের এই বিশাল অপচয় এবং বাড়তি বংশবৃদ্ধির (Prodigality of Reproduction বা Over Production) ব্যাপারটার অবশ্যই কোনও ব্যাখ্যা থাকতে হবে!

শুধু যে আমাদের চারপাশে অনেক বাড়তি প্রাণের জন্ম হয় তাই তো নয়, প্রত্যেক প্রজাতির জীবের নিজেদের মধ্যেই আবার অসংখ্য ছোট বড় পার্থক্য দেখা যায়— মানুষের কথাই ধরুন না, আমাদের একজনের সাথে আরেক জনের তো কোনও মিল নেই। গায়ের রঙে পার্থক্য, চোখের রঙে, আকারে পার্থক্য, দেখতে একেক জন একেকরকম, কেউ বা বেশি দিন বাঁচে, কেউ বা কম, কাউকে বেশি রোগে ধরে, কাউকে কম, কারও গায়ে বেশি শক্তি আবার কারও কম— এমন হাজারোতর পার্থক্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এর বিভিন্নরকম উদাহরণ দেখেছিলাম। বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন প্রজাতির শিশুরা তাদের বাবা-মার থেকে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে, যৌন পদ্ধতি থেকে জন্মানো এই প্রতিটি প্রাণী বা উদ্ভিদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এর ফলে যে কোনও প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পার্থক্য বা *প্রকারণ** দেখা যায়। সে সময় জেনেটিক্স বা বংশগতি বিদ্যার আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন প্রকারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে পারেন নি, কিন্তু তিনি এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেঁচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলতে থাকে একই ধরনের প্রজাতির ভেতরের প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং এক প্রজাতির সঙ্গে আরেক প্রজাতির মধ্যে। আবার প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা প্রকারণের কারণে এই অনন্ত প্রাকৃতিক সংগ্রামে কেউ বা সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়, আর অন্যরা আগেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে,

একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সংগ্রাম করে যারা টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তারাই শুধু পরবর্তী প্রজন্মে বংশধর রেখে যেতে পারে এবং তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোরই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশি প্রকটভাবে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ, যে প্রকারণগুলো তাদের পরিবেশের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযোজনের (Adaptation) ক্ষমতা রাখে, তাদের বাহক জীবরাই বেশিদিন টিকে থাকে এবং বেশি পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রকৃতি প্রতিটা জীবের মধ্যে পরিবেশগতভাবে অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করতে থাকে এবং ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা *Natural Selection. (চলবে)*

**Variation* শব্দটার অর্থ হিসেবে পার্থক্য, প্রকারভেদ, পরিবৃত্তি বা প্রকারণ দুটোই দেখা যায়, আমি এখানে প্রকারণ শব্দটাই ব্যবহার করছি; আবার Heridity শব্দটার জন্য বাংলায় অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন— বংশগতি, বংশানুস্মৃতি, উত্তরাধিকার, জন্মগত বা বংশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। আমি এখানে Heridity বোঝাতে 'বংশগত বৈশিষ্ট্য'ই ব্যবহার করবো, যার অর্থ হচ্ছে বাবা এবং মার থেকে পাওয়া জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো যেগুলো তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়)।*

Reference

(১) নারায়ণ সেন, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চার'শ কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।
(২) সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশক : সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।
(৩) ড. ম আখতারুজ্জামান, (২০০২), বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
(৪) http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/IVAartselection.shtml
(৫) http://www.bbc.co.uk/education/darwin/leghist/dawkins.htm
(৬) Dr. Berra, M. Tim (1990). Evolution and the Myth of Creationism. Stanford
(৭) http://www.talkorigins.org/faqs/modern-synthesis.html
(৮) Ridley, Mark (2004). Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.
(৯) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml
(১০) http://www.talkorigins.org/faqs/geohist.html

বিচিত্রা. ৮ম বর্ষ 27 সংখ্যা, 12ই মে 2006

বিবর্তনের পথ ধরে

বন্যা আহমেদ

পরবর্তী প্রজন্মে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিশ্রণ ঘটে; যেম ধরুন, বাবার গায়ের রঙ কালো আর মার গায়ের ফর্সা হলে ছেলেমেয়ের গায়ের রঙ মিশ্রিত হয়ে শ্যামলা হয়ে যেতে পারে

তৃতীয় অধ্যায়

অনন্ত সময়ের উপহার

(গত সংখ্যার পর)

ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের বংশগতি বিদ্যা বা জেনেটিক্স (genetics) সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। জীবাশ্মবিদ্যা (Paleontology) বা ফসিল রেকর্ডও তখন তেমন জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে ডারউইন কীভাবে এই সব জ্ঞান ছাড়াই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিলেন! তার এই বিবর্তন তত্ত্ব ইউরোপের খ্রিস্টধর্মসহ অন্যান্য সব ধর্মের ভিতকেই টলিয়ে দিল, আদম হাওয়ার গল্প পরিণত হলো রূপকথায়, নুহের মহাপ্লাবনের সময় প্রজাতির নতুন করে টিকে যাওয়ার কেচ্ছা গেল হাওয়ায় ভেসে। আগেই বলেছি, জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান দু'টি, প্রথমত তথ্য ও যুক্তির উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যে, প্রাণের বিবর্তন ঘটছে সৃষ্টির আদি থেকে (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আর দ্বিতীয়তঃ এই বিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। হৈচৈ পরে গেল সারা বিশ্বজুড়ে ১৯৫৮ সালে ডারউইন এবং ওয়ালেস এই তত্ত্ব প্রস্তাব করার পর। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রজাতি বদলাচ্ছে–তা বিশ্বাস করা এক কথা, আর এই পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, কোনও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ছাড়াই তা মেনে নেয়া আরেক কথা!

সে সময়ের ইউরোপে প্রাণের সৃষ্টি সংক্রান্ত দর্শনের পুরোটাই ছিল বিখ্যাত ঈশ্বরতত্ত্ববাদী উইলিয়াম প্যালের (William Paley, 1743-1805) সৃষ্টিতত্ত্ববাদ দিয়ে প্রভাবিত।

তিনি বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা ঘড়ির যেমন একজন কারিগর থাকে তেমনি প্রত্যেকটা প্রাণেরও পেছনে একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। ঘড়ির মতো একটা জটিল জিনিস যেমন কারিগর ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না তেমনি এত জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন জীবগুলোও সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীতে জন্মাতে পারে না। তাই ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন দেখালেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অন্ধ, অচেতন কিন্তু অনাকস্মিক এবং নিতান্তই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু জীবের বিবর্তনই ঘটছে না, নতুন নতুন প্রজাতিরও সৃষ্টি হচ্ছে এবং ধাপে ধাপে জটিল থেকে জটিলতর প্রাণেরও সৃষ্টি ও বিলুপ্তি ঘটছে তখন স্বভাবতই ইউরোপের রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে। রেঁনেসা, পুঁজিবাদের বিকাশ, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদির কারণে তখন মহাপ্রতাপশালী চার্চের ক্ষমতা বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে ইউরোপে, ইচ্ছা করলেই তারা আর ডাইনী বানিয়ে কিংবা বাইবেলের বিরোধিতার অজুহাতে একে ওকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। তাই ডারউইন এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও কম অপমান এবং সমালোচনার স্বীকার হতে হয়নি তাকে, ক্যারিক্যাচারি কার্টুন থেকে শুরু করে, গালিগালাজের ঝড় বয়ে যেতে থাকল তার উপর। যেমন নিচের ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল হর্নেট ম্যাগাজিনে ১৮৭১ সালে। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায় ডারউইনের তত্ত্ব সে সময় ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কি পরিমাণ গাত্রদাহের কারণ ঘটিয়েছিল; তারা বানরের দেহের সাথে ডারউইনের মুখমণ্ডল জুড়ে দিয়ে এ ধরনের নানা বিদ্রুপাত্মক ছবি এঁকে ডারউইনকে তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল।

ডারউইন নিজে খুব বেশি উত্তর না দিলেও তার বন্ধুরা, স্টিভেন হেন্সলো, টিএইচ হাক্সলি, জোসেফ ডাল্টন হুকার, অ্যাশা গ্রে প্রমুখ, তার হয়ে ল যেতে থাকেন। বিশেষ করে হাক্সলিকে তো তখ 'ডারউইনের বুল ডগ' বলেই ডাকা হতো।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা না বললেই নয়–একবার এক সভায় বিবর্তনের তীব্র বিরোধিতাকারী খ্রিস্টান ধর্ম বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের তত্ত্বকে ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিগত মতামত বলে আক্রমণ করেন। তখনই তিনি হঠাৎ করে সভায় উপস্থিত হাক্সলিকে উদ্দেশ্য করে জানতে চান তার দাদা এবং দাদীর মধ্যে কে আসলে বানর ছিলেন। তারই উত্তরে হাক্সলি বিবর্তনবাদের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বিশপকে তুলাধুনা তো করে ছাড়েনই বক্তৃতার শেষে এসে তিনি এও বলেন যে,

'যে ব্যক্তি তার মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাগ্মিতাকে কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার উত্তরসূরি না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসূরি হতে চাইবো যারা গাছে গাছে বাস করে, যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় (৩)।'

এদিকে আবার বিগেল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিটজরয়ও আরেক কাণ্ড করে বসলেন সেই সভায়। তিনি বাইবেল হাতে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বলতে থাকলেন যে, সব দোষ আসলে তারই, তিনি যদি ডারউইনকে তার জাহাজে করে বিশ্ব ভ্রমণে নিয়ে না যেতেন তাহলে ডারউইন এভাবে ধর্মের ক্ষতি করার সুযোগ পেতেন না। তবে অনেকেই মনে করেন যে, ফিটজরয়ের মানসিক সমস্যা ছিল এবং তিনি এর কিছুদিন পরে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে আজ অবধি বিতর্কের ও বিরোধিতার কোনও শেষ নেই। যদিও মাইক্রো-বায়োলজি, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স

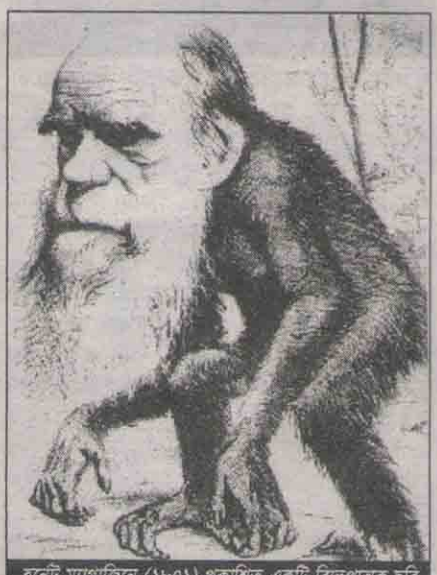

হর্নেট ম্যাগাজিনে (১৮৭১) প্রকাশিত একটি বিদ্রুপাত্মক ছবি
সৌজন্যে : www.mun.ca/biology/scarr/Darwin as Monkey.htm

ইত্যাদি আধুনিক জীববিজ্ঞানের শাখা যত এগিয়েছে, ততই অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিবর্তনবাদের সঠিকতা! কিন্তু তার ফলে ধর্মবাদীরা থেমে যায়নি, বরং আমেরিকার মতো জায়গায় তারা সরকার এবং প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন পেয়ে ইদানীং মহাশক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আর কুলাচ্ছে না দেখে এখন আইডি (ID or Intelligent Design) নামের মোড়কে পুরে নতুন করে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টায় নেমেছে, এ নিয়ে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

সে যাই হোক, চলুন আমরা আবার ফিরে যাই ডারউইনের প্রসঙ্গে। বিজ্ঞান তো তার তত্ত্বের পর চুপ করে বসে থাকেনি, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে বার বার পুরনো তত্ত্বকে ঝালাই করে নেয়াই তার কাজ। ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, এমনকি বর্জন করে হলেও সে আরও আধুনিক এবং উন্নত তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে। ডারউইনের সময় পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কীভাবে কাজ করে তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনও স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। আমরা ল্যামার্কের (জীন-ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক, ১৭৪৪-১৮২৯) কথা শুনেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে। ডারউইনের আগে তিনিই প্রথম সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে। যদিও তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে প্রকল্প দেন তা পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তিনি মনে করতেন যে, জীবের যে অংগগুলো তার জীবনে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আরও উন্নত হতে থাকে, আর যেগুলোর বেশি ব্যবহার হয় না সেগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় বা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে যাওয়ার গল্প, লম্বা লম্বা গাছের ডগা থেকে কচি পাতা পেরে খাওয়ার জন্য কসরত করতে করতে বহু প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গিয়েছিল। বিবর্তন সম্পর্কে এরকম একটা ভুল ধারণা এখনও প্রচলিত আছে, যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইল। ল্যামার্ক আরও বললেন যে, একটি জীব তার জীবদ্দশায় ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে সেগুলো তার পরবর্তী প্রজন্মে বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেমন ধরুন, জুতো পরতে পরতে আপনার পায়ে যদি স্থায়ীভাবে ঠোসা পরে যায় তাহলে কি পরবর্তী প্রজন্মের পায়েও সেই ঠোসা দেখা যাবে! এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তিনি সে সময়ের আরও অন্যান্য জীববিজ্ঞানীদের মতো এটাও ভাবতেন যে, পরবর্তী প্রজন্মে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিশ্রণ ঘটে; যেমন ধরুন, বাবার গায়ের রঙ কালো আর মার গায়ের রঙ ফর্সা হলে ছেলেমেয়ের গায়ের রঙ মিশ্রিত হয়ে শ্যামলা হয়ে যেতে পারে! কিন্তু ডারউইন এটা ঠিকই বুঝেছিলেন যে,

কোনও অঙ্গের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে জীবের বিবর্তন ঘটে না, প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করার জন্য শুধু বংশগতভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায় তারাই দায়ী। যে বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আপনার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার দেহে পাননি, তার উপর বিবর্তন কাজ করতে পারে না। তিনি Origin of Species বইতে লিখলেন, 'Any varation which does not inherit is unimportant to us'.

কিন্তু ল্যামার্কের অন্য দু'টি তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন বেশ বিপাকে পড়লেন, আসলেই কি জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়? সত্যিই কি বাবা-মার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়? কিন্তু আসলেই যদি এভাবে বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটে তাহলে কি তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না? আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্যতম প্রধান শর্তই হচ্ছে যে, প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রকারণ বা ভেরিয়েশন থাকতে হবে, যার ফলশ্রুতিতেই জীবের মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতায় ভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে যদি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত হয়ে যেতে থাকে তাহলে তো হাজার প্রজন্ম পরে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, প্রকারণ থাকবে কি করে? তখনও জেনেটিক্সের আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন এর সদুত্তর দিতে পারলেন না, এমনকি কখনও কখনও তিনি ল্যামার্কের তত্ত্বকেই সঠিক বলে ধরে নিলেন। বিবর্তনবাদের বিরোধিরা সে সময় তার এই সংশয়কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহার করতেন।

অথচ তার সমস্যার সমাধান অবশ্যই দিতে পারতেন গ্রেগর মেন্ডেল (Gregor Mendel ১৮২২—১৮৮৪), যিনি ১৮৬৫ সালেই তার জিনতত্ত্বটি প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি মা-বাবার দু'জনের মধ্যে বিদ্যমান বংশগতির একক বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে 'ফ্যাক্টর' বলে অভিহিত করেছিলেন, তবে, পরবর্তী সময়ে ১৯০৯ সালে Wilhem Ludvig Johannsen একে জিন' হিসেবে নামকরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, ডারউইন মেন্ডেলের লেখাটা পড়ারই সুযোগ পেলেন না। আসলে সে সময় কেউই মেন্ডেলের আবিষ্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করায় তার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা তখনকার মতো হারিয়েই গেল কালের গহ্বরে। তারপর ১৯০০ সালের দিকে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হলো তার কাজ। আমরা অবাক হয়ে জানতে পারলাম, ডারউইন যে সমস্যাগুলো নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তার সমাধান ছিল একেবারেই তার হাতের ডগায়। মেন্ডেল দেখালেন যে, ছেলেমেয়ের প্রত্যেকটা বংশগত বৈশিষ্ট্য মা-বাবার কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্য দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। বাবা-মার কোষের ভেতরের এই ফ্যাক্টর বা জিনগুলো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এখন আমরা জানি যে,

জিন হচ্ছে ডিএনএ (DNA) দিয়ে তৈরি বংশগতির (inheritence) একক, যার মধ্যে মানুষের কোষের বিভিন্ন রকমের প্রোটিন তৈরির (এবং তার ফলশ্রুতিতেই কোষ তৈরি হয়) তথ্য বা কোড জমা থাকে। বাবা এবং মার যৌন কোষে এই জিনগুলো থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জন্য দু'জনের থেকে একটা করে জিন পেয়ে থাকে। এই জিনগুলোর মধ্যে কোনওরকম কোনও মিশ্রণ ঘটে না এবং একটা বৈশিষ্ট্যের জিন আরেকটার ওপর কোনওভাবে নির্ভরশীল নয়।

অর্থাৎ, আপনার চোখের রঙ-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে নাকের আকারের বৈশিষ্ট্যের কোনও সম্পর্ক নেই, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জিন আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে আপনি আপনার বাবা বা মার কাছ থেকে কোনও একটা জিন হয় পাবেন না হয় পাবেন না, এর মাঝামাঝি কোনও ব্যবস্থা এখানে নেই। একইভাবে আপনার বাবা-মাও তাদের পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জিনগুলো পেয়ে এসেছে। এভাবেই, জিনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে বিভিন্ন জীবের মাঝে। ড. রিচার্ড ডকিনস খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাপারটিকে, 'This argument can be applied repeatedly for an indefinite number of generations. Discrete single genes are shuffled independently through the generations like cards in a pack, rather than being mixed like the ingredients of a pudding' (৫). আর এর আবিষ্কারটির ফলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সম্পর্কে অন্যতম প্রধান বিরোধিটির নিরসন হলো।

এরপর গত একশ' বছরে জেনেটিক্স এবং মাইক্রো-বায়োলজি বা অনু-জীববিদ্যা এগিয়ে গেছে অকল্পনীয় গতিতে। ক্রোমসম, ডিএনএ এবং মিউটেশন থেকে শুরু করে মানুষের জিনোমের পর্যন্ত হিসাব বের করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন তো জীববিজ্ঞানীরা রীতিমতো দাবি করছেন যে, যদি একটা ফসিলের চিহ্নও পৃথিবীর বুকে কোনওদিন না পাওয়া যেত তাহলেও আজকের জেনেটিক্সের জ্ঞান এবং আমাদের ডিএনএ'র মধ্যে লেখা পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর হাজার বছরের ইতিহাস থেকেই বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করে ফেলা যেত। এ বিষয়টি আপাতত তোলা থাক পরবর্তী সময়ে কোনও এক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য। বরং এখন খুব সংক্ষেপে দেখা যাক, জেনেটিক্সের আলোয় ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মূল চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কীভাবে পরিবর্ধিত হয়ে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ ধারণ করল।

আগেই দেখেছি, জীবন সংগ্রামে যে সব প্রকারণ বা ভেরিয়েশন জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশি সুবিধা করে দেয় সেই সব জিনের অধিকারী জীবই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে এবং যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশি সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হয়। ডারউইন বিবর্তনকে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং প্রজাতি লেভেলে, এখন বোঝা যাচ্ছে যে,

বিবর্তন ঘটছে জিন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং জনপুঞ্জের লেভেলে (৭)। একটি প্রজাতির কতগুলো জীব যখন নিজেদের মধ্যে যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তখন তাদের জনপুঞ্জের সবার জিনের সমষ্টিকে একসঙ্গে বলে জিন পুল (জিন পুল) বা জিন-ভাণ্ডার। একদিকে যৌন প্রজননের মাধ্যমে প্রতি প্রজন্মে জিনের অদলবদল হয়, আবার অন্যদিকে জিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটার ফলে কখনও কখনও তার ডিএনএ'র গঠন বা সংখ্যাতেও পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা হয় মিউটেশন (মিউটেশন)। মিউটেশনের মাধ্যমেই প্রকারণের সৃষ্টি হচ্ছে আর তারপর যৌন প্রজননের মাধ্যমে তার সমগ্র জিন পুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে শুধু একটি বা দু'টি জীবের জীনগত পরিবর্তনকেই বিবর্তন বলে ধরে নেয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জনপুঞ্জের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না যে বিবর্তন ঘটছে। তার মানে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এরকম—

বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বেশিদিন বেঁচে থাকে এবং বেশি বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তার ফলে তাদের জিন অনেক বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হয় সন্তানদের মধ্যে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে একটি জীবের জনসংখ্যায় জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বা মাত্রা বদলাতে থাকে-পরবর্তী প্রজন্মে কিছু জিন বেশি প্রবাহিত হয় আর কিছু জীনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জনপুঞ্জে জিনের পরিবর্তন ঘটতে থাকাকেই বিবর্তন বলে। জেনেটিক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বংশগত প্রকারণগুলোর প্রভেদমূলক প্রজননকে (Differential reproduction) বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন; আর প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও প্রজাতির জনসংখ্যায় জীন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনকে বলে বিবর্তন(৬)।

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের অভিযোজন (Adaptation) ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর তারই ফলশ্রুতিতে সে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য আরও যোগ্যতর হয়ে গড়ে ওঠে। তবে এখন আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও আরও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমেও বিবর্তন ঘটতে পারে-যেমন ধরুন, মিউটেশনের কথা আমরা একটু আগেই শুনেছি, এছাড়াও জীবের একাংশের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা (geographical separation), জেনেটিক ড্রিফট (genetic drift), বহিরাগমন ইত্যাদির কারণেও বিবর্তন ঘটে থাকে। এ বিষয়গুলো এবং এখান থেকে কীভাবে প্রজাতির উদ্ভব বা বিলুপ্তি ঘটে তা নিয়ে পরের কোনও পর্বে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

পরিবেশ এখানে নির্বাচনী প্রতিভূ (Selection agent) হিসেবে কাজ করে এবং যেহেতু সময় এবং অঞ্চল বিশেষে পরিবেশ বদলে যায় তাই বিভিন্ন পরিবেশে জীবের বিভিন্ন প্রকারণ নির্বাচিত হয়। আর তাই, কোনও জায়গার জীবকে বিচার করতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের আপেক্ষিকতায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে একটা প্রজাতি তার পরিবেশের সাথে আরও বেশি করে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে অর্থাৎ তার অভিযোজনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা প্রজাতির যে সব জীবের দেহে সেই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অনুকূল বৈশিষ্ট্যের জিন বেশি থাকে তারাই বেঁচে থাকে, বেশি পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাদের জিন অনেক বেশি পরিমাণে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে পরে। যেমন ধরুন, বরফ যুগে কানাডার মতো দেশে একটি প্রজাতির টিকে থাকার জন্য যে জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি গুরুত্ব ছিল তারা এখনকার পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাও পালন করতে পারে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরে পেপারড মথের (Biston betularia) বিবর্তন থেকে। বিজ্ঞানীরা গত ১৪০ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পেপারড মথের এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। এই ইংলিশ মথ প্রজাতিটিকে হাল্কা এবং গাঢ়-দু'টি রঙয়েই দেখতে পাওয়া যায় এবং যেহেতু তারা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাদের মথের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রজননও ঘটতে দেখা যায়। শুধু এক জোড়া জিন দিয়ে এদের গায়ের রঙ নিয়ন্ত্রিত হয়। এদেরকে সাধারণত লিচেন নামের এক ধরনের পরজীবি ছত্রাক দিয়ে ঢাকা গাছের ডালের ওপর দেখা যায়। ১৮৪৮ সালের জাদুঘরের এক সংগ্রহ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে সে সময়ে গাঢ় রঙয়ের মথের সংখ্যা ছিল ১% এরও কম, আর বাকি প্রায় ৯৯% মথই ছিল হাল্কা রঙয়ের। এই পোকাগুলো পাখিদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। হাল্কা রঙ-এর লিচেন দিয়ে ঘেরা গাছের ডালগুলোতে বসে থাকা গাঢ় রঙ মথগুলো খুব সহজেই পাখিদের চোখে পরত এবং তাদের শিকারে পরিণত হতো। অন্যদিকে হাল্কা রঙ-এর পোকাগুলো গাছের ডালের রঙ-এর সাথে মিশে থাকায় তাদেরকে পাখিরা সহজে আর দেখতে পেত না এবং তার ফলে তারা শিকারি পাখিদের হাতে ধরাও পরত কম। এর ফলশ্রুতিতে দেখা গেল যে, প্রতি প্রজন্মে হাল্কা রঙ-এর জিন ধারণকারী মথের সংখ্যা সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কারখানা থেকে আসা ঝুল, ময়লা দিয়ে বাতাস অনেক বেশি দূষিত হয়ে পরতে থাকে। এই পরিবেশ দূষণের কারণে গাছের ডালের উপরের লিচেনগুলো হয় মারা যায় অথবা তাদের উপর এক ধরনের গাঢ় রঙ-এর প্রলেপ পরে যায়। তার ফলে দেখা গেল যে, এই মথগুলোর চারপাশের পরিবেশই ক্রমশ বদলে যাচ্ছে, এখন গাঢ় রঙয়ের প্রলেপ পরা লিচেন-এর উপর বসে থাকা হাল্কা রঙয়ের মথগুলো আগে থেকে অনেক বেশি করে পাখিগুলোর চোখে পরছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হলো- এবার হাল্কা রঙ-এর মথের সংখ্যা ক্রমশ কমে গেল এবং গাঢ় রঙ-এর মথের সংখ্যা বেড়ে যেতে শুরু করল। কিছুদিন পরে আরেক পরিসংখ্যানে দেখা গেল যে, পেপারড মথের জনসংখ্যার ৯৫%ই গাঢ় রঙ-এর মথে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়, এর পরপরই ইংল্যান্ডে বাতাসের দূষণ রোধের জন্য আইন পাস করানো হয় এবং দ্রুত বাতাসের দূষণও কমতে শুরু করে। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আবারও ঠিকই দেখা গেল যে, হাল্কা রঙ-এর মথের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। পাখিদের দিয়ে আরোপিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আমরা দেখলাম যে কি করে একটা জিন পুলের মধ্যে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বদলে যেতে পারে এবং তার ফলে সেই জনপুঞ্জে কি করে বিবর্তন ঘটে।

ভাবলে খুবই অবাক হতে হয় যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো এত সহজ একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা বিবর্তনের তত্ত্বটা আসলে কতখানি গভীর। আজকে প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, অনু-জীববিজ্ঞান কিংবা ওষুধ বা কিটনাশক তৈরি, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা অচল হয়ে পড়বে বিবর্তনের মূল তত্ত্বটাকে অস্বীকার করলে। ডারউইন প্রায় দেড়শ' বছর আগে যা বলে গেলেন তার সারকথা প্রমাণ করতে আমাদের এতদিন লেগে গেল। আর জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যতই চাঞ্চল্যকর এবং আধুনিক আবিষ্কার দিয়ে ভরে উঠতে থাকল ততই নতুন করে প্রমাণিত হতে থাকল বিবর্তনের যথার্থতা। দ্বিপদী এই মানব প্রজাতিটার বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সেই আদি এক কোষী প্রাণী থেকে সৃষ্টি হওয়ার জন্য কোনও স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, অন্য সব জীবের মতোই কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে তার। যতই সে নিজেকে ঘিরে শ্রেষ্ঠত্বের মায়াজাল তৈরি করুক না কেন, সে আর সব প্রাণীর মতো এই প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র। (চলবে)

*gene জিন-এর বাংলা হিসেবে বংশগতির একক, প্রজনন কণা, বংশাণু ইত্যাদি অনেক শব্দই ব্যবহার করা হয়, তবে আমি এখানে জিন শব্দটিই ব্যবহার করব।

Reference

(১) নারায়ণ সেন, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চার'শ কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।
(২) সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশক : সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।
(৩) ড. ম আখতারুজ্জামান, (২০০২), বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।
(৪) http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/IVAartselection.shtml
(৫) http://www.bbc.co.uk/education/darwin/leghist/dawkins.htm
(৬) Dr. Berra, M. Tim (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford
(৭) http://www.talkorigins.org/faqs/modern-synthesis.html
(৮) Ridley, Mark (2004), Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.
(৯) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml
(১০) http://www.talkorigins.org/faqs/geohist.html